দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য জীবনে আবির্ভাব ও ক্রমপরিণতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য জীবনে আবির্ভাব ও ক্রমপরিণতি

জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যচর্চা শুরু হয় মার্কসীয় যুদ্ধপৃষ্ট প্রতিবেশের আলোকে এবং 'কল্লোল'-এর আবহমানতায়। তাঁর মানসলোকের যে ছবি তুলে ধরেছে তাঁর কাব্য ও গদ্যভান্ডার — তা মূলত গড়ে উঠেছে জীবনানন্দ দাশের উক্ত আবহমানতার মধ্যেই জীবন, সময়, সমাজ ও সভ্যতাকে বোঝবার চেষ্টার মধ্যে। তাঁর উপন্যাস-মালায় যেমন নব নবতর মানস ও চেতনালোকের স্তর উন্মোচিত করেছে, তেমনি তাঁর অনন্য কাব্য নির্মাণ-কলায় ফুটে উঠেছে চিত্ররূপময়তার প্রতিমা।

সর্বপ্রথম মায়ের কাছ থেকে কবিতা লেখার আস্বাদ অনুভব করেন জীবনানন্দ। কাব্যচর্চার প্রধান প্রেরণা ছিলেন তাঁর মা। কবির মা নিজেও ভালো কবিতা লিখতেন। স্কুলের পাঠ্য তালিকায় কবির কবিতা ছাপা হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' ১৯২৭ সালে প্রকাশ পায়। 'ধূসর পান্ডুলিপি' প্রকাশ পায় ১৯৩৬ সালে। 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলি 'প্রগতি', 'ধূপছায়া', 'কল্লোল' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কল্লোলে'র গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন তিনি। জীবনানন্দের উপাধি ছিল 'দাশগুপ্ত' যখন প্রথম কল্লোলে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে 'গুপ্ত' ত্যাগ করে তিনি শুধু 'দাশ' ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম কবিতা 'নীলিমা' (১৩৩২ ফাল্গুন) কল্লোলেই প্রকাশিত হয়। তাঁর 'নীলিমা' কবিতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কল্লোলেই তাঁর শেষ কবিতা 'পাখিরা' (বৈশাখ ১৩৩৬) প্রকাশিত হয়েছিল। 'পাখিরা' কবিতায় রোমাঞ্চিত হয়ে সমকালীন কবি বুদ্ধদেব বসু বহুবিধ মন্তব্য করেছিলেন। কল্লোলের কর্তৃপক্ষকে জীবনানন্দের কবিতা প্রথম দিকে তেমন একটা খুশী করতে পারেনি বলেই জানা যায়। তবে কিছুদিনের মধ্যে তাঁর 'ঝরাপালক' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) কবিতার ছন্দ, ভাষা, ভাব, তারুণ্যের উল্লাস — কল্লোলের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরকতা দান করেছে তাঁকে।

যাঁদের নিয়ে বাংলা সাহিত্য ভান্ডার রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময়ে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সর্বাপেক্ষা বেশি আলোচিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু মনে করেন, ১৯৩০-এর পরবর্তী কোনো আলোচনা জীবনানন্দকে বাদ দিয়ে বাংলা কাব্যে ঘটেনি। 'ঝরাপালক' (১৯২৭), 'ধূসর পান্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) 'সাতটি

তারার তিমির' (১৯৪৮) — জীবনানন্দের জীবিতাবস্থায় এই পাঁচটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া মৃত্যুর পর আরও পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল — 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১), 'সুদর্শনা' (১৯৭৩), 'মনবিহঙ্গম' (১৯৭৯), 'আলোপৃথিবী' (১৯৮২)। জীবনানন্দ দাশের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান হতে শুরু করে একের পর এক কবিতার পুনর্মুদ্রণে। পরিপূর্ণ রোমান্টিকতা ছিল তাঁর প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থে। পরবর্তী কবিতাগুলির আধুনিকতা ও প্রকৃতির বিচিত্রতা ভিন্ন মাত্রায় অপূর্ব চিত্ররূপময়তা নিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। কবিকে মোহমুক্ত দেখি ১৯৪৬-৪৭ সালের কবিতায় — সেখানে পৃথিবীর ক্ষয়, ভয়ার্ত, বিবর্ণ চেহারা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। আবার কোথাও বা ভালোবাসা যে জীবনের অচির স্থায়িত্ব এনে দিয়েছে — কবি যে তার উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাও দেখা যায়। তাঁর কবিতায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একথা উপলব্ধি করা যায় — ভাষায় গতি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আবেদনের মর্মার্থ পরিস্ফুট করেছে কবির চিত্রকল্প।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ প্রহর থেকে জীবনানন্দের কবি জীবনের শুরু। জাতীয় আন্দোলনের সময় রচিত হয় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। জীবনানন্দ বাংলাকে নিয়ে ৫০টির বেশি কবিতা লেখেন ১৯৩২-এর মার্চ মাসেই। তাঁর এই কবিতায় স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে দেশ ও কালের প্রতি সচেতনতার প্রবল বিস্তৃতি। 'মহাপৃথিবী'র কবি হলেও তিনি একাধারে ছিলেন বাঙালিরও কবি। বাংলার রূপ মুগ্ধতার প্রতীক তাঁর এই কবিতাগুলি। মায়ের সাহায্য ও প্রেরণার মাধ্যমেই জীবনানন্দ পেয়ে যান সাহিত্যচর্চার উপাদান ও স্বাদ। তাই তিনি নিজেই লিখেছেন — "আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্যপ্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্য রসিক হয়েই মুক্তিলাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প-উপন্যাস স্বদেশী ও বিদেশী — নেহাৎ কম পড়িনি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোঁচে নি।"[১] কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে পিতা-মাতার সান্নিধ্য ও মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়ে স্কুল পর্যায়ে কাব্যানুশীলন করা। কবিকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছে বাংলা ও ইংরাজি রোমান্টিক কবিতা। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মানসিক পরিবর্তন ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। তাঁর মানসিক পরিবর্তনের কারণ মূলত ইয়োরোপীয় অর্থনীতি, জ্ঞানবোধ ও শিল্পধর্মের পরিবর্তিত পরিস্থিতি। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব, নারী সম্পর্কের স্বপ্নচারী মনোভাব, ফ্রয়েডের সর্বযৌনবাদীতত্ত্ব, সমকালীন ইয়োরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার যুগযন্ত্রণা — কবির সামনে তখন উন্মোচিত হতে শুরু করে। জীবনানন্দের অন্তর্জগৎকে আলোড়িত করে —হেনরী জেমস। ডরোথী রিচার্ডসন, জেমস

জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, কাফকা প্রমুখ সাহিত্যিকের গল্প-উপন্যাসে ইউরোপীয় যুগযন্ত্রণা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী চেতনা নীতিহীন, যৌনতা, বন্ধ্যাত্ব। তাঁর অন্তর্গত সাহিত্যভাবনা আত্মকথন ও চেতনাপ্রবাহ রীতিতে গড়ে উঠতে থাকে। ইয়োরোপীয় বাস্তবতায় বিচরণের মাধ্যমে তাঁর আত্মিক বিকাশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর মনে নতুন বোধের জন্ম দিয়েছে ঔপনিবেশিকদের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, মূল্যবোধের বিকৃতি, অত্যাচার ও শোষণ। জীবনানন্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক এই প্রেক্ষাপটে কলকাতায় বাস রত ছিলেন। নবতর জিজ্ঞাসা রোপিত হয়েছিল জীবনানন্দের জীবনে। পিতার রাজনীতি, দর্শন, পারিবারিক পরিকাঠামো এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

পরবর্তীকালে তিনি কোনদিন পিতা-মাতার কাছ থেকে পাওয়া নীতিধর্ম ত্যাগ করেননি। মায়ের প্রেরণায় 'বর্ষ আবাহন' কবিতাটি 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবির রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন কতিপয় রচনা আমরা তাঁর কাব্যরচনার প্রথম পর্বে পাই — 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩২-৩৩ বঙ্গাব্দে — দেশবন্ধুর প্রয়াণে, বিবেকানন্দ, ভারতবর্ষ, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি কবিতা। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গত জানিয়েছেন — জীবনানন্দের সাহিত্যজীবনের সূচনা পর্বের ধারণা নির্ভুল নয়।

এরপর কলকাতার সি. টি. কলেজে ইংরাজি সাহিত্য বিভাগে ১৯২২ সালে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কর্মজীবন শুরু এখানেই। কবিতাচর্চা ও শিক্ষকতা দুইয়ের মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকলেও দুয়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন বিপরীতধর্মিতা। আইনচর্চা ও আইনবিষয়ক পড়াশোনাতেও লিপ্ত ছিলেন মাঝেমধ্যে। তিনি কলকাতা ছাড়তে চাননি, কারণ কলকাতার জীবনযাত্রা তাঁকে সাহিত্য জীবনে অনেক তথ্য জুগিয়েছে। কলকাতার জনজীবনের আকর্ষণে তাঁর সাহিত্যভাবনার আনন্দলাভ কবিকে উৎপীড়িত করেছিল, অপরপক্ষে পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ, পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যা, অসচ্ছলতা, জ্যেষ্ঠ পুত্রের দায়বদ্ধতা তাঁকে উদ্বিগ্ন করলেও বরিশালের জীবনযাত্রা সাহিত্যচর্চার অন্তরায় হবে বলে তাঁর ধারণা ছিল। এই মানসিক টানাপোড়েনের জন্য কবি চাকরি নিয়ে নিশ্চিত জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে চান এবং নির্বিঘ্নে সাহিত্যচর্চায় নিমজ্জিত হন।

কলকাতায় দীনেশ চন্দ্র দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) ও গোকুল চন্দ্র নাগের (১৮৯৪-১৯২৫) 'কল্লোল', প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৭৬) 'কালি কলম', ঢাকাকেন্দ্রিক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ও অজিত কুমার দত্তের (১৯০৭-১৯৭৯)

'প্রগতি' পত্রিকার মাধ্যমেই জীবনানন্দের সাহিত্যচর্চার সূচনাপর্বের বিকাশ সমৃদ্ধ হয়েছে। শুধু কবিতা নয় — জীবনানন্দ অবলোকন করেছেন ও উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছেন — দুই বিপরীত প্রান্ত কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬) এবং মোহিতলাল মজুমদারকে (১৮৮৮-১৯৫২)।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে জীবনানন্দের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল কল্লোল পর্বেই। কল্লোল কালেই বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের বন্ধু হন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর সম্মুখেও নিজেকে উজাড় করে দিতে সক্ষম হননি জীবনানন্দ। তিনি ছিলেন মূলত নিঃসঙ্গ, প্রকৃতিপ্রেমিক, মফঃস্বলের প্রতি আকৃষ্ট স্বভাব কবি। তিনি সাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন নি।

বিশ শতকে জীবনানন্দ বয়ে নিয়ে এলেন আধুনিক সাহিত্যে স্বতন্ত্র সুর। জীবনানন্দের সাহিত্য জীবনে প্রবল আঘাত এল ১৯২৮ সালে — সাহিত্যধারায় নব সুর বহন করে আনলেও তিনি চাকরিচ্যুত হলেন কলেজ অভ্যন্তরীণ গোলযোগে। গোলযোগ বৃদ্ধি পায় ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং কলেজে আইন অমান্য করায়। কয়েকজন অধ্যাপক চাকরিচ্যুত হন কলেজের অর্থসংকটের ফলে। সাহিত্য সাধনায় জীবনানন্দের এই বেকারত্ব প্রবল আঘাত হানে; অন্যদিকে 'বঙ্গবাণী' প্রগতি, কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকাও ধীরে ধীরে বন্ধ হতে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য মন্দার প্রেক্ষাপটে মানসিক দিক থেকে বিভ্রান্ত বেকার জীবনানন্দের এই জীবন সংকটে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯২৮ ও ২৯ সাল প্রায় সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় কবির জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এমতাবস্থায় খুলনার বাগেরহাট কলেজে মাস তিনেক চাকরি করবার পর তিনি কলকাতায় ফিরে এসে টিউশন শুরু করেন এবং চাকরি সন্ধান করেন। দিল্লী রামযশ কলেজে যোগদান করেন ১৮২৯ সালে। এইসময় তিনি বিবাহের কারণে মার্চ মাসে বরিশাল এলে, ছুটির অভাবে তাঁর চাকরিও চলে যায়। অপরদিকে স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা-র সঙ্গে আবেগপ্রবণতায় তিনি উপলব্ধি করলেন শান্তি সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ তিনি পাবেন না। তাই তিনি বলেছেন — "সমাজ যত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃৎ হোক না কেন, প্রেম, প্রকৃতি, সৃষ্টি-প্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোনো ঐকান্তিক কবি বা মনীষীর জীবনে ঘটে কি? ঘটে নি তো আমার জীবনে।" [২]

ক্রমশ জীবনানন্দ তাঁর কাব্যজীবন সম্পর্কে শঙ্কিত হতে শুরু করেছিলেন। অহেতুক অকর্মণ্যতার পরিচয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে উঠল সাহিত্যচর্চা করে অর্থ উপার্জন করা। জীবনানন্দ নিঃসঙ্গ পীড়িত হয়ে উঠলেন পারিবারিক সহমর্মিতা ও সান্নিধ্য না পাওয়ায়। জীবনানন্দ সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়েন সাংসারিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অসচ্ছলতা থেকে উত্তরণের অক্ষমতায়।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত জীবনানন্দের জীবনের অস্থিরতা কাব্যজীবনের রুদ্ধতা এনে দেয়। তিনি তাঁর কাব্যজীবনকে যে সবার উপরে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তার অপূর্ণতা কবিজীবনে হাহাকার এনে দেয়। কবি জীবনে মানসিক ক্ষতের সৃষ্টি হয় সংসার জীবনে অর্থসংকট, সংসারের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা, কবি জীবনের অপূর্ণতা, সর্বোপরি দাম্পত্য সংকটের ফলে। ১৯৩১ সালে ব্রাহ্ম সমাজের হৃদয়হীনতায় ক্ষত-বিক্ষত, বিভ্রান্ত জীবনানন্দের কলকাতা বাসপর্বে পুনরায় রচিত হতে থাকে নানা গল্প, উপন্যাস, রূপসী বাংলা কবিতাগুচ্ছ। জীবনানন্দ কলকাতার প্রভাবশালী সমাজের যথেচ্ছাচার, জীবনভোগের বাসনা, ভণ্ডামী, ধর্মান্ধতায় আক্রান্ত হয়ে নানাভাবে তাঁর লেখনীকে আক্রান্ত করেছেন। বিশ্বমানবের, মহাবিশ্বলোকের সময়ের হাতে আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন তাঁর অব্যক্ত যন্ত্রণা থেকে। তিনি সৃষ্টিশীলতায়, নিসর্গের সৌন্দর্যে ঝাঁপ দিয়েছেন দাম্পত্য, সমাজ, সংসার থেকে কোনো আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেননি বলে।

তিনি ব্রজমোহন কলেজে যোগ দেন ১৯৩৫ সালে। ছোটগল্প তিনি ১৯৩১-১৯৩৩ সাল পর্যন্ত রচনা করেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কপি পাঠিয়েছিলেন। আত্মপরিচয়ের দ্বারা তিনি রবীন্দ্রনাথের সহায়তা ও বিস্তৃত আলোচনা করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লিখেছিলেন — "তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।"[৩] এরপর তিনি কলকাতায় কোনভাবে একটা চাকরির প্রয়োজন কবি উপলব্ধি করেছেন। কাব্যচর্চা ও সর্বোপরি সাহিত্যচর্চার জন্য কোলকাতায় প্রত্যাগমনের প্রচেষ্টা সফল হয় কবি জীবনানন্দের। জীবনানন্দ ১৯৪৬-এর জুলাই মাসে বরিশাল ত্যাগ করেন — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা, দাঙ্গা, মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ ইত্যাদির পর। তিনি কোলকাতাতে দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ১৯৪৭-১৯৫০ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় কাটান। নির্ধারণ করা হয়, দ্বিতীয়বার গদ্যরচনা এবং বেকারত্ব একই সময়কালের মধ্যে ঘটেছে। যদিও জীবনানন্দ দাশকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কবি জীবনানন্দ দাশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবুও 'সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালে' তিনি ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিকও হয়ে উঠেছিলেন।

জীবনানন্দের সংকট মুহূর্তগুলোতে তাঁর সামনে এসে পড়েছে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বাস্তবের রূঢ় প্রান্তগুলোর নগ্নরূপ। তিনি তা সম্পূর্ণ রূপে অবলোকন করলেও পূর্ণরূপে

তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত করতে পারেন নি। 'ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি' — ১৯৪৬ সালে জীবনানন্দের প্রভাকর সেনকে লেখা চিঠির উক্ত মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক।

তিনি তাঁর গদ্যরচনার মধ্যে নানা আঙ্গিকে সাবলিলভাবে জীবনের নানা দিক, নানা জিজ্ঞাসা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন। নানা চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে তাঁর কথাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় নানা অভিজ্ঞতা। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বিভিন্ন চরিত্র ও বিষয়বস্তুকে তিনি আলোকপাত করেছেন পারিবারিক নানা সম্পর্কের নিরিখে।

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" — এই জাতীয় স্পর্ধা প্রকৃতপক্ষে বাল্যখিল্যতারই নামান্তর। যিনি একথা লিখতে পেরেছেন, তাঁর কবিতা হাজার বছর ধরে পঠিত হচ্ছে বা হাজার বছর পরেও পঠিত হবে। সৎ ও বিশুদ্ধ কবি যে তাঁর নিজের ভাষায় নিজের সাহিত্যে দুই-এক শতাব্দী কিংবা তারও বেশি বেঁচে থাকে, বিশ্বসাহিতের প্রতিটি ভাষায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগামী দূত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত। কোন সাহিত্যের আয়ুষ্কাল যাইহোক না কেন, সাধারণত একজন ব্যক্তিবিশেষ পাঠকের আয়ুষ্কাল, খুব বেশি হলে শতবর্ষের মধ্যে সীমিত। তাই তাঁর কাছে ব্যক্তিগত প্রিয় লেখক বা কবির জন্মশতবর্ষ তাঁর জীবনে একবারই আসতে পারে, কখনো বা সেটাও সম্ভব হয় না। আমরা যারা জীবনানন্দের কাব্য-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক তারা কবির জন্মশতবর্ষ প্রত্যক্ষ করতে পেরে অন্তত একদিক দিয়ে বিশেষ ভাবে সৌভাগ্যবান।

জীবনানন্দ দাশ এমন এক নাম, যিনি রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালি কবিতা পাঠকের চিত্তে প্রগাঢ় সাড়া ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও লক্ষণীয় বিষয় হল — জীবনানন্দ দাশের আত্মোন্নতিপরায়ণতা। জীবনানন্দের আকস্মিক জীবনাবসানের পূর্বেই ১৯৫৪ সালের মে মাসে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর অক্টোবর মাসে তাঁর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর পর তাঁকে ঘিরে পাঠকদের জিজ্ঞাসা ও আগ্রহ বেড়ে গেল তুমুলভাবে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র দ্বিতীয় সংস্করণ জীবনানন্দের পাঠকদের কাছে কবির স্বদিষ্ট কবিতার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে আরও বাড়িয়ে দিল। 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশ ছিল কবিকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করবার সামিল। তার সঙ্গে আরও দু-চারটি স্মরণীয় ঘটনা হল — জীবনানন্দের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে ইন্দ্র-দুর্গার ও সত্যজিৎ রায়ের মত সৃজনশীল শিল্পীকে দিয়ে প্রচ্ছদপট আঁকানো এবং সিগনেট, নাভানা জাতীয় প্রকাশকদের ইচ্ছা

ও রুচি যোগে তাঁর কাব্যগ্রন্থের সৌষ্ঠবে এমন রূপান্তর ঘটানো, যাতে অনন্য নান্দনিক মর্যাদায় উন্নীত হয়। সমকালীন অন্যকোন কবির কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা ঘটেনি। অন্যদিকে জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের (উপন্যাস ও ছোটগল্প) অপ্রকাশিত রত্নভান্ডার উদ্ধারের পর জীবনানন্দ-চর্চার মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটে গেছে সহজভাবেই। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে দেবেশ রায় কর্তৃক জীবনানন্দ রচনার অনবদ্য সম্পাদনা উক্ত চর্চাকে একটি সুসংহত শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে চালিত করার পক্ষে নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি বড় পদক্ষেপ। অন্যদিকে দেবেশ রায় সম্পাদিত কবি হস্তাক্ষর লিপিতে 'রূপসী বাংলা'র প্রকাশ (১৯৮৪) বাংলা প্রকাশনার জগতে যুগান্তরের নির্দেশক। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকালী'র ন্যায় কবির স্ব-হস্তাক্ষরে আদ্যোপান্ত একটি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা বঙ্গদেশের অতি বিরল ঘটনা। সম্পাদক দেবেশ রায় 'জীবনানন্দ সমগ্র'তে জানিয়েছেন — জীবনানন্দ রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবেই পরিচিত, যার প্রতিভার দিগন্তের বিস্তার আমাদের বিস্ময় স্তম্ভিত চোখের সামনে ক্রমশই ঘটে চলেছে। যেখানে তিনি গল্পকার অথবা ঔপন্যাসিক হিসেবেই শিখর ছুঁয়ে আছেন।

জীবনানন্দ এমন একজন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব যিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে বদলেছেন, ভেঙ্গেছেন এবং গড়েছেন। এই বদলটা ঘটে মূলত তাঁর বলার ও রচনার ঢঙে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক কাব্য ও কবিতা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, নদী চলতে চলতে যেদিকে বাঁক নেয় তা হল সাহিত্যের আধুনিকতা। এই বাঁক নেওয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' (১৯২৭) এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬)তে এসে। এই শিল্পচেতনা ও বাক্‌ভঙ্গি দেখে বিস্মিত পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে, কবির 'বোধ' তাঁকে কিভাবে চালনা করছে! সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনানন্দ সংগ্রহের এক ভূমিকায় এ বিষয়ে বলেছেন — 'ঝরাপালক'-এর কবিতাগুলি পড়লে বিশ্বাস জন্মায় না এই কবি কোন একদিন 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'র ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত হবেন। 'সাতটি তারার তিমির'-এবং 'ঝরাপালক'-এ আবেগময় কবি চিরাচরিতের পুনরাবৃত্তি সূচক জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে অনেক ভাব গর্ভ কথা উচ্চারণ করেছেন। নিজস্বতা বর্জিত, শব্দের মায়াবিহীন, ভাবালুতায় দৃষ্টি কবির আচ্ছন্ন। তুলনায় অনেক অপ্রধান কবিও অনেক পরিণত। তবু 'ঝরাপালক'-এর একটা বিশেষ মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এই কবিতাবলী দেখে বোধ হয়, নেহাতই উল্কাপাতের মতো এই কবি বাংলা কবিতার জগতে আবির্ভূত হননি। ট্র্যাডিশনের অন্তর্গত ও একদা একসময়

প্রথাসিদ্ধ কবিতার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন তিনি। ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ও শব্দ নির্বাচনে নজরুলের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। আরও বিস্ময়কর বিষয় হল, এই প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে নিজস্ব ধারার প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'বনলতা সেন' হয়ে 'মহাপৃথিবী'তে আমরা এই নতুন কবিকেই আস্বাদন করি। 'রূপসী বাংলা' হল আর এক অধ্যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার সঙ্গে আশা-প্রেরণার সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে এ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ যার উল্লেখ করেছিলেন — অর্থাৎ এই গ্রন্থগুলিতে শুধু তাঁর 'তাকিয়ে দেখার চোখ'-ই নয়, তার দেশি-বিদেশি কাব্যের ব্যপ্ত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ পঠন-পাঠনও কাজে লাগল। এক্ষেত্রে এডগার অ্যালান পো এবং বিশেষ করে ইয়েটস ও এলিয়ট পাঠ। পূর্ববঙ্গের তথা তাঁর জন্মভূমি বরিশালের জল জঙ্গলের নিসর্গ প্রকৃতি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ছাঁচে পড়ে এবং আঞ্চলিক উপভাষার শব্দের মিশ্রণে একপ্রকার স্বকীয় কাব্যবৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করল। জীবনানন্দের পরবর্তীকালের কাব্যেও দেখা গেছে, তিনি তাঁর বাক্‌ভঙ্গি প্রধানত মহাপয়ারে বেঁধেছেন, মাত্রাবৃত্ত যেখানে প্রায় নেই বললেই চলে এবং সাধু চলিত ক্রিয়াপদের একটা মিশ্রণ (যা পাঠককে খানিকটা বিব্রত-ই করে) পাওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আবার বিশেষ উপযোগী বলেও মনে হয়েছে, যেমন 'কি কথা তাহার সাথে, তার সাথে' (সুরঞ্জনা)।

কিন্তু গ্রামীণ প্রকৃতি ও মফস্বল পর্ব থেকে যখন মহানগরে এসে দিক্‌বদল ঘটে তাকেই জীবনানন্দের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বলে মনে করা হয়। 'সাতটি তারার তিমির'-এর মহাজিজ্ঞাসার পর 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'র সংশয় ও প্রশ্নদীর্ণ আধুনিক মনস্কের সংকট ও তার থেকে উত্তরণের কালপর্বে এই পর্যায় গোচরীভূত হয় জীবনানন্দে। জীবনানন্দের এই সময়ের কবিতার ছত্রে ছত্রে সেই আলোড়ন আমাদের আন্দোলিত ও ভাবিত করে তোলে। মহাযুদ্ধকালীন মন্বন্তর-দাঙ্গা-হানাহানি-দেশভাগজনিত ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়ে তাঁর কবিতা "মৃত্যুশব্দ-রক্তশব্দ-ভীতিশব্দ"-এর মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলছে। এই পর্বেই তাঁর যে আর একটি নতুন চৈতন্যের উত্তরণ ঘটে। তাই তো — "কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে" - এটা আজকালকার প্রশস্তিকারীদের তরল আবেগচালিত বাক্য নয়, যা একটি লব্ধে পরিণত হয়েছে। এটি তার নব-উত্তরণের পথে চির চেনা প্রত্যাশা দৃষ্টি।

'কালের পুতুল' গ্রন্থে জীবনানন্দকে এক প্রধান কবির অভিধা দেন বুদ্ধদেব বসু। প্রসঙ্গত সেই বুদ্ধদেব বসুও জীবনানন্দের মনন জিজ্ঞাসা প্রধান কবিতাগুলিকে গ্রহণ করতে

দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন যখন 'কবিতা' পত্রিকায় পর পর তাঁর কবিতা প্রকাশিত হচ্ছিল। কারণ তাঁর উপলব্ধিতে জীবনানন্দ শুধুমাত্র 'নির্জনতার কবি', প্রকৃতি প্রেমের কবি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তো 'সাতটি তারার তিমির' কিংবা 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' আমাদের কাছে কবির কাব্যকৃতির শ্রেষ্ঠ পর্যায় এবং এক নবতর বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত বলে মনে হয়। মনে হয় যেন এক বিরলতম ক্ষমতায় তিনি নিজেকেই নিজে ছাড়িয়ে উঠছেন। কালের আবর্তনকে তিনি চিহ্নিত করেছেন "কোনও আমলকি নাই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে" বলে। সেই জিজ্ঞাসা আজও রয়েছে।

যে সময়টির কথা বলছি সে সময় বিষ্ণু দে-কে জীবনানন্দ দাশ একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন — 'কেন লিখি'-তে লেখার জন্যে তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছেন এবং সে দায়িত্ব পালন স্বরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে দু-তিন পাতা লিখে পাঠাচ্ছেন। হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় ফ্যাসি-বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে 'কেন লিখি' সংকলনটি তখন ছাপা হয়। তাতে জীবনানন্দ যা লিখেছেন তা হল — জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। কবির অভিজ্ঞতা যা আকাশ পাতাল সমস্তই উপলব্ধি করে নিতে চায় তাও তো মানবীয়। কারণ জীবন এই জীবনের পদ্ধতি যে কোনো সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে বড়ো, এরই ভিতরে মানুষের সমবায় ব্যবস্থা বার বার ভেঙ্গে যাচ্ছে ও নতুন ভাবে গড়ে উঠছে। আমাদের এই গ্রহের সবচেয়ে বরণীয় দৃষ্টান্ত মানুষ। কোন বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্তেও নিজেকে অন্যরূপ কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন; তার কল্পনা প্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিংবা নতুনভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এইসব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সময়। কবিতা লেখার কাজ খুব উন্নতভাবে সম্পন্ন করার পক্ষে রচয়িতার সচেতন জীবনদর্শন ও সেই মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করবার মতো লিপি কুশলতাই যথেষ্ট। কবি যাদের জীবনের পরিজন মনে করেন তাদের অস্বস্তি বিলোপ করে দিতে না পেরে জ্ঞানময় করার প্রয়াস পান। এই কথাটি প্রচার করে যে জীবন নিয়েই কবিতা।

এরই মধ্যে হয়ত নাগরিক মননঋদ্ধ ও জিজ্ঞাসা প্রধান কাব্য সৃষ্টির একটি চাবি যেন আমরা পেয়ে যাই জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'র মধ্যে। কিংবা কবি যখন তাঁর উত্তরণে বিজ্ঞান ধারণায় ইতিহাস চেতনা ও কালচেতনার মর্মবিন্দুটিতেও পৌঁছতে চান তখন হয়তো আমরা আরও বেশিই পেয়ে যাই। জ্ঞানের দিগ্‌দর্শনে সবকিছুর মতো

এরও পূর্বসুরী রবীন্দ্রনাথ। যে তাগিদে তিনি 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থ কিংবা "আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনী হয়ে উঠলো রাঙা হয়ে" ('আমি' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) রচনা করেন — সে সব কবিতায় কোয়ান্টাম তত্ত্বে বিশ্ব ব্যাপারে দ্রষ্টার অবস্থানের ভূমিকায় কবি।

উক্ত সময়ে জীবনানন্দ প্রথমে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্ত' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন ও পরবর্তীকালে মার্ক্সিস্ট ট্রটস্কি পন্থী সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'য়। এই সময় সূত্রে, ফ্যাসী বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ অর্থাৎ প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে জীবনানন্দের একটি পরোক্ষ যোগের কথা মনে করা যায়। (যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ এমনকি বিষ্ণু দেও প্রগতি শিবিরের অতি বিচ্যুতি পর্যায়ে তীব্র সমালোচনার ধাচে বিমত্ত না হয়ে পারেন নি, সে ভুল অবশ্য পরে প্রত্যাহৃত হয়।)

কবি শঙ্খ ঘোষ বলেন এই সামগ্রিকতাবোধেই জীবনানন্দকে বুঝে নেওয়া যায় — "একথা সত্য যে, তাঁর কবিতার কোন কোন বিশেষ যুগে কোন কোন বিশেষ মানবকাল বা বিশ্বকাল বা বক্তিকালকে আমরা খানিকটা ওই ক্রমেই চিহ্নিত করে নিয়েছি। কিন্তু তাঁর কবিতায় এই তিনের মধ্যে 'কেউ কাউকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে না', কবির নিজের অন্তত সেইরকমই মনে হয়েছিল। এক ঢেউ জল অন্য ঢেউয়ের মধ্যে গড়িয়ে যাওয়ার মতই জীবনানন্দের কবিতায় সমস্ত ভেতরে ভেতরে 'কাল'ই তেমন জড়িয়ে যায়। আর সেই কারণেই তাঁর কবিতায় সমাজের মধ্যে প্রকৃতি, জীবনের মধ্যে মৃত্যু, ভরসার মধ্যে নিরাশা একযোগে বলে যেতে থাকে। কোন একটিকে আলাদা করে দেখার আর কোন মানে থাকে না আর।

'পাখিরা' কবিতাটিতে যেন আমরা মিউজিক ধ্বনিময়তা শুনতে পাই। "মকর সংক্রান্তির রাতে" কবিতাটির শিরোনামের পরই তাই তাঁকে দ্বিতীয় শীর্ষকের মতোই প্রথম ব্র্যাকেটে লিখতে হলো "(আবহমান ইতিহাস চেতনা একটি পাখির মতো যেন।)";

— "পৃথিবী ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায়;
পৃথিবী প্রতিভা হ'য়ে আকাশের মতো এক শুভ্রতায় নেমে
নিজেকে মেলাতে গিয়ে বেবিলন লন্ডন
দিল্লি কলকাতার নক্‌টার্নে
অভিভূত হ'য়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে ঃ গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হ'য়ে যাবে নাকি! —
সূর্যে, আরও নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও — প্রাণ দাও পাখি।"

এর পরবর্তী কবিতা 'উত্তর প্রবেশে' তিনি লিখছেন;

"প্লেন আছে;
অগণন প্লেন
অগণ্য এয়োরোড্রোম
র'য়ে গেছে।
চারিদিকে উঁচু-নিচু অন্তহীন নীড় —
হ'লেও বা হয়ে যেতো পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর;"

— এরই শেষ ক'টি পংক্তি এরকম;

"উত্তর প্রবেশ করে আরো বড় চেতনার লোকে;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।"

('উত্তর প্রবেশ', 'সাতটি তারার তিমির')

সব মিলিয়ে একটিই পড়া হয়েছে বলে মনে হয় জীবনানন্দের কবিতার প্রবাহমানতায়; তাঁরই পুনরুক্তির মধ্যে এই সময়েরই 'তৃতীয় অঙ্ক'-এ কবির ওই — "প্রাণ দাও প্রাণ দাও — পাখি"-র প্রার্থনা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে বহুবার। — এতো মানব ভবিতব্যতারই উদ্বেগে। তার কবিতায় যে এক রহস্য গুণ্ঠনের আকর্ষণ প্রতিনিয়ত আমাদের সে উদ্‌ঘাটনের পথে নিয়ে যায় বলে আমার ধারণা "মায়াবীর মতো যাদু বলে।" "অমল পৃথিবী" ও সত্তা পরিচয়ের জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে যে "স্বপ্ন দেখে মানব সভ্যতা চিরকাল।" বিষ্ণু দে তো রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই বলতে পারেন "লাল নীল কমলের দেশে বরকনের সত্তার" — সম্মিলনে "প্রাণ মন চায় বরাভয়" — যেমনভাবে জীবনানন্দ বলেন; "তবু নরনারীর ভীড়ে নবনবীন প্রাকসাধনার অনুকম্পার কথা।" তাই বলা যায়, জীবনানন্দ যে "জ্ঞানের বিষণ্ণলোভী আলো" — "সফল মানবপ্রেমে উৎসারিত" হতে চায় — শুধু তারই জন্য কবি লিখেছেন —

"তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমির বিলাসী?

আমরা তো তিমির বিনাশী
হ'তে চাই
আমরা তো তিমির বিনাশী।"

('তিমির হননের গান' — 'সাতটি তারার তিমির')

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'কবিতা' পত্রিকায় 'বনলতা সেন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছিলেন — "তিনি শুধুই কবিতা লেখেন, গল্প কিংবা প্রবন্ধ লেখেন না, ..।" সেই সময় পর্যন্ত অবশ্য জীবনানন্দ প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায় তা সত্যি বিশেষ লেখেননি। কিন্তু প্রবন্ধ লেখার কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন সে সময়। ১৯৩০-৩১ সাল থেকেই জীবনানন্দ গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু করলেও এবং সেগুলি প্রকাশ করবার ইচ্ছেসূচক মন্তব্য সেই সময়ের কিছু কিছু চিঠিতে তিনি লিখলেও, তাঁর দিক থেকে তেমন কোন জোরালো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। হয়তো সে ব্যাপারে তাঁর মনে কিছু দ্বিধা ছিল। অবশ্য তাঁর প্রবন্ধগুলির বিষয়ে সেকথা কোনমতেই বলা যায় না। কেননা, তৎকালীন নানা পত্র-পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। 'জীবনানন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল' গ্রন্থে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, পত্রিকা সম্পাদকের দাবি ও হয়তো অর্থের প্রয়োজন কিছুটা থাকলেও একথা বলা যেতে পারে যে, প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ যথেষ্ট আত্মবিশাসী ও অকুণ্ঠিত ছিলেন।

'ফর্মাল' ও 'পার্সোনাল' — প্রবন্ধকে যে এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, সেক্ষেত্রে উভয়প্রকার প্রবন্ধের রীতির ভিন্নতা পরিলক্ষিত। 'পার্সোনাল' প্রবন্ধ বলতে সাধারণভাবে যে মনোময় রম্য প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে — জীবনানন্দ সেরকম প্রবন্ধ লেখেননি। তবে তাঁর শিল্পী সত্তাকে টেনে বার করে আনে সে সব প্রবন্ধ — যা কবিতা বিষয়ক। সর্বোপরি তাঁর এই প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনাগুলির সঙ্গে তিনি একজন প্রকৃত কবি ও লেখক হিসেবে একটা মনোঘনিষ্ঠতা অনুভব না করে পারেন নি। লেখাগুলি বক্তব্যনিষ্ঠ কিন্তু মন্ময়তায় ভরপুর। মনের ভাষাটি ব্যবহার করে তিনি সর্বদা বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার দায় স্বীকার করে নিতে পারেন না। তাঁর মনের অজান্তেই কখনও এটা ঘটে যায়।

দ্বিতীয় কারণটিও অবশ্যক্রমে পূর্বোক্ত মানসিক পরিস্থিতি সঞ্জাত। জীবনানন্দ সর্বত্রই কবি হিসেবে আত্মমগ্ন হয়ে গেছেন বিষয়ের সঙ্গে — কবিতা সম্পর্কিত কিছু বলবার অবকাশে। নিরাসক্তসিদ্ধ আলোচক হতে পারেননি তিনি। সত্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেননি নিজস্ব উপলব্ধির যাবতীয় অনুভবে। সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার কথা মনে হলেও 'ফর্মাল' প্রবন্ধের

বাঁধানো ভাবগুলিতে বারবারই স্ব-আরোপিত শৃঙ্খল থেকে তাঁর কবি সত্তা স্রোতের মত প্লাবিত হয়েছে। তাঁর মন দিয়ে বিচার করতে হবে তাঁর প্রবন্ধকে। তবে জীবনানন্দের প্রবন্ধ পড়ার সময় মানুষ জীবনানন্দকে ভুললে চলবে না — কারণ ব্যক্তিসত্তার সমগ্র পরিপ্রেক্ষিত মনে না রেখে সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের মাপে বিচার করতে গেলে আজ তাঁর অনেক রচনার যুক্তি দুর্বল মনে হতে পারে।

'কবিতা' পত্রিকার বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যার জন্য জীবনানন্দের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। এই সংখ্যাটির পরিকল্পনা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বিশেষত, কবিদের কথা শোনাবার জন্যই। আর সেই 'কবিতার কথা' নামক প্রবন্ধটির প্রথম দুটি বাক্য আজ প্রায় প্রবাদে পরিণত — "সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি; ..."।

একটি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক রচনাই হল জীবনানন্দ দাশের প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা ধরে বরিশাল থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ তখন ছাব্বিশ বৎসর বয়সের যুবক। জীবনানন্দের মাতামহ চন্দ্রনাথ দাশের অগ্রজ ভ্রাতা কালীমোহন দাশের প্রশস্তি প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু। বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজে অনুষ্ঠিত কালীমোহনের শ্রাদ্ধবাসরে রচনাটি পঠিত হয়েছিল। এর ভাষা অতীব প্রাঞ্জল ও সাধুগদ্যে রচিত। জীবনানন্দের কবিতা-গল্প-উপন্যাসের ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী ও অব্যর্থ — কথাটি হয়তো এখানেই বলা প্রযোজ্য। তাঁর ভাষা সুগভীর ও চেতনাস্পর্শী এবং অভাবিতপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তবে তা ঠিক প্রাঞ্জলতা নয়। তাঁর মনের সঙ্গে পাঠক-মনের সহ-সংযোগ স্থাপিত হতে দেখা যায় না। তা অবশ্য অবশ্যই ঈষৎ প্রাথমিক আয়ত্তিকরণের অপেক্ষা রাখে। অতিমাত্রায় মনোলীন কোনো বর্ণনাকে যখন তিনি প্রকাশ করতে চাইছেন — কাব্য সৃষ্টি, কাব্যবোধ বা কাব্য অনুভূতির অত্যন্ত সূক্ষ্ম কোন স্তর — সেই মন্ময় কবিপ্রাণতাকেই সম্পূর্ণ রূপে বোঝাবার চেষ্টায় ভাষার মধ্যে একটা স্ব-উৎসারিত ঘূর্ণি তৈরি হয়ে যায় — যেটা কিছুটা আত্মমননের সাহায্যে পাঠককে বুঝতে হবে। কিন্তু একথা সহজে বোঝা যায় যে, প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ তাঁর অনুভূতিবোধ ও বক্তব্য বিষয়কে যথাসম্ভব সুগম্য করে তুলতে চেয়েছিলেন।

সৃজনধর্মী সাহিত্য লেখকের একান্ত নিজস্ব অনুভবকে সত্যনিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করে সেখানে অন্তর্চেতনাকে প্রাণময় রূপ দেওয়াই তাঁর লিখন কার্যের নিশানা বিন্দু — এরকম চিন্তা সম্ভবত প্রাবন্ধিকের ছিল। নিজেরই প্রাণের আরাধ্য অভিসারে সে ভাষার রহস্য প্রত্যেক পাঠক নিজে আবিষ্কার করে নেবেন — কিন্তু প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো একটি বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা

বা কোন একটি বিষয় সম্পর্কে নিজের ভাবনা-চিন্তার স্তরগুলি সমাধানের ইঙ্গিত পাঠককে জানানো বা বোঝানো। যেহেতু প্রবন্ধ লেখা হবে সেই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই, তাই তার ভাষা ও উপস্থাপনাকে সচেতনভাবে সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল রাখার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। ৭.৬.১৯৩৭-এ তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন — "রবীন্দ্রনাথের অলংকারবহুল গদ্য সাহিত্য পরিশেষে মনের ভিতর অবসাদের সৃষ্টি করে। আপনার স্ফটিকের আলোর মতন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার গদ্য প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে এক অবর্ণনীয় জিনিষ বলে মনে হয়। বাংলা সাহিত্যে এ জিনিষ কোনদিন ছিল না; আজো তৈরী হল না; আপনি একাই প্রচুর পরিমাণে দিয়ে গেলেন।"[৪]

১৯৩৭ সালে তিনি বরিশাল সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন বলে জানা যায়। সেটি কোথাও রক্ষিত হয়নি সম্ভবত। তিনি দুটি শোক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন ১৯৪১ সালে। রসরঞ্জন সেন — যিনি বরিশাল বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, যাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত শোক পুস্তিকায় উক্ত নিবন্ধটি 'স্মরণে' শিরোনামে ছাপা হয় এবং রসরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে সেটি পঠিতও হয়েছিল। পূর্বের লেখাটির মতো এই লেখাটিতেও সৎ, বিবেকবান, বিলাসী জীবনের মোহমুক্ত, আদর্শবাদী মানুষের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। আরো দুবার তিনি এই জাতীয় প্রবন্ধে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর 'আমার মা বাবা' (১৯৪৮) প্রবন্ধে আমরা তার পরিচয় পাই। এখানেও গদ্য আগের মতই সরল ও প্রাঞ্জল তবে রীতি চলিত। জীবনানন্দের ঐ প্রথম প্রবন্ধেই শুধু বাংলা সাধু ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় এবং সমসাময়িক তাঁর কিছু চিঠিপত্রে এর স্বাক্ষর মেলে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতার দিক থেকে 'কবিতার কথা' প্রবন্ধ 'কবিতা' পত্রিকার প্রবন্ধ সংখ্যার জন্য এই স্মৃতিমূলক রচনা দুটির আগেই লেখা হয়ে গেছে। ১৩৫১ বঙ্গাব্দ থেকে তাঁর প্রবন্ধ লেখা নিয়মিত হয়ে গেছে নানা পত্র-পত্রিকায়। বিশিষ্ট একটি সংকলনের জন্য ১৩৫০-এ জীবনানন্দ একটি তাৎপর্যময় গদ্যরচনা করেছিলেন। তৎকালীন কলকাতার বামপন্থী চিন্তাধারার অন্যতম পরিপোষক গোষ্ঠী 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' একটি ছোট রচনা সংকলন প্রকাশ করেন ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। যার নাম ছিল — 'কেন লিখি' এই সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মুখবন্ধে স্পষ্টতই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সম্পাদকের অভিমত — এই যে সাহিত্যের ও শিল্পের তাগিদ আসে সমাজ থেকে, মেঘলোক থেকেও নয়, মানুষের অন্তর্লোক থেকেও নয়। তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন এমন পনেরো জন লেখককে, যাঁরা বিধিবদ্ধ বামপন্থায় একান্ত আস্থার কথা ঘোষণা করেননি অথচ

মানবতাবাদী লেখক হিসাবে যাঁদের পরিচয় অজানা ছিল না। এঁরা হলেন — অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, অন্নদাশংকর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুখ। সম্পাদকেরা জানিয়েছিলেন যে ভূমিকায় আজ তারা নামছে তা পাঠক ও লেখক উভয়ের পক্ষে সমান ও নতুন।

'কবিতার কথা'-র চারটি সংস্করণ (সিগনেট প্রথম সং ১৩৬২, ৪র্থ সং ১৩৮৭) হয়ে গেলে সেই গ্রন্থধৃত প্রবন্ধগুলি কোন্ পত্রিকায় ও কবে প্রকাশিত হয়েছিল তার নির্দেশ করা হয়নি। তবে আমরা জানতে পারি যে অন্যান্য গবেষকেরা নানা জায়গায় সে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। ১৩৪৫-এর বৈশাখের 'কবিতা' পত্রিকায় 'কবিতার কথা' প্রকাশিত হবার পর, 'প্রভাতী' পৌষ ১৩৫১ — 'মাত্রাচেতনা', 'শারদীয় বসুমতী' ১৩৫৪ — 'কবিতার আত্মা ও শরীর', 'আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যা' ১৩৫৫ — 'কি হিসেবে শাশ্বত', 'শারদীয় দ্বন্দ্ব', ১৩৫৭ — 'আধুনিক কবিতা' এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা আশ্বিন ১৩৫৭ ও কার্তিক পৌষ ১৩৬০-এ যথাক্রমে 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ' ও 'অসমাপ্ত আলোচনা' প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সাতটি ছাড়া বাকী আটটির মধ্যে ছ'টি প্রবন্ধ ''পূর্বাশা' পত্রিকার কার্তিক ১৩৫৩ ও ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, আশ্বিন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' — নামক প্রবন্ধ দুটি ব্রজমোহন কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা ১৩৬১-৬২ সালে এবং 'ময়ূখ' পত্রিকায় কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের ১৩৬১ সংখ্যায় প্রবন্ধ দুটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এর রচনাকাল ১৩৫২ বঙ্গাব্দ বা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে বোঝা যায় — 'উত্তর রৈবিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটির মধ্যে 'আজকের এই উনিশশো ছেচল্লিশ সালে জানুয়ারী মাসে' বলে এই বাক্যাংশ থেকে। 'একাশী বৎসরে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হলো' — এই বাক্যটি দিয়ে অপর প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে — ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ বলে এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি 'স্বরাজ' পত্রিকার সাময়িকী ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৪শে শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আরো একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বলে জানা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামকে নিয়েও জীবনানন্দ পৃথক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। একটি প্রবন্ধ 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নজরুলের মনোপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতা ছিল না বলে তার কবিতা চমৎকার হলেও মনোত্তীর্ণ হয়নি — একথা জীবনানন্দ মনে করতেন।

'কবিতাপাঠ' নামক অন্য প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের 'আনন্দবাজার' পত্রিকার

শারদীয় সংখ্যায়। দুজন কবি — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল এখানে তাঁর আলোচ্য। সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন যে, অনেকদিনের ঘষা মোটা সাদা সত্যগুলিকে আধুনিক অর্থনৈতিক বা মনোবিকলন দর্শনের সাহায্যে নতুন মূল্যে নির্ণয় না করে তাদের পুরাতন মূল্য বড় গলায় প্রচার করে গেছেন। তাই সেটা কিশোর কণ্ঠের আওয়াজ বলে ভ্রম হয়। আবার নজরুল সম্পর্কে বলেছেন যে, উনিশ শতকের ইতিহাস প্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়তাবাদী কবি ছিলেন নজরুল ইসলাম।

'স্টেটস্‌ম্যান'-এ ৬ নভেম্বর, ১৯৪৯-এ প্রকাশিত হলো তাঁর ইংরেজীতে রচিত কবিতা বিষয়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ — 'Bengali Poetry Today'। অনতিদীর্ঘ এই রচনাটিতে তিনি আধুনিক কবিতার যথাযোগ্য সম্মানের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করার পাশাপাশি আধুনিক যুগ মানসের সঙ্গে কবিতার যোগসূত্র খুঁজেছেন।

কবিতা সম্বন্ধে না হলেও সামগ্রিক বাংলা সাহিত্য ও গদ্য সাহিত্য নিয়েও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৬ চৈত্র ১৩৫৮ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। যার নাম ছিল 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'। 'ময়ূখ' আষাঢ় ১৩৬৫-তে অন্য একটি প্রবন্ধ 'লেখার কথা' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু লেখকের মৃত্যুর চার বছর পর প্রবন্ধটি কোথা থেকে পাওয়া গেল সে সম্বন্ধে সম্পাদকেরা নীরব থেকেছেন। সেইসঙ্গে বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে জীবনানন্দের ধারণা কি ছিল তা জানারও আমাদের কৌতূহল থাকে। এবং তাঁর খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি ইংরাজী প্রবন্ধের সাহায্যে সেই কৌতূহল কিছুটা হলেও উপশম হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৫০-এ 'হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড' পত্রিকায় রবিবাসরীয় বিভাগে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম ছিল — 'Bengali Novel Today'। ইংল্যান্ড ও ভারতের পৃথক ধরনের সামাজিক বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন তিনি প্রবন্ধটির শুরুতেই। তিনি বেশ বিস্মিত হয়েছেন বিশ্বজোড়া সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিবরণে। আধুনিক সভ্যতা যে একটি দুর্বহ ভারের মতো — একথা তাঁর মনে হচ্ছিল — তাঁর সমসাময়িক কবিতা পাঠে আমরা জানতে পারি। এরপর তিনি বাংলা উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাফল্যের কথা বলে এ যুগের লেখকদের পক্ষে যে সেরকম "Great magnitrede"-এ উপন্যাস পরিকল্পনা করা সম্ভব নয় বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে নিজের মানস বিন্দুর চারিদিকে কারো নাগরিক জীবনের বিচিত্র জটিল সমগ্রতা কোন একক ব্যক্তির পক্ষে অন্তরস্থ করা সম্ভব নয় — আজকের লেখকদের আবর্তিত হতে হবে।

পরবর্তী অংশে আসে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের

আলোচনা সমকালীন উপন্যাসে এঁরা তিনজন প্রধান। তাঁর উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল তারাশঙ্করের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতার আহরণকে শিল্পিত করবার ক্ষমতা। বিভূতিভূষণ ও মানিকের লেখাতে তিনি "greatness" -এর অভাবের কথা বলেছেন দুজনের কল্পনা শক্তি ও অভিজ্ঞতা মনস্তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করেও। তিনি "perfect" উপন্যাস বলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'-কে। আজকের যুগের একটি উপন্যাসকে মহৎ করে তুলতে পারে বাহ্য অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য নয়, আত্ম নিমজ্জনের অতলতা — প্রবন্ধটির পরিসমাপ্তিতে তিনি একথাই বলতে চেয়েছেন।

জীবনানন্দের লেখা পুস্তক সমালোচনাগুলির প্রসঙ্গ চলে আসবে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সূত্র ধরে। এ পর্যন্ত আমরা তাঁর সাতটি পুস্তক সমালোচনা দেখেছি। সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ' ও 'উষা' পত্রিকায়। 'কবিতা'-য় জীবনানন্দের প্রথম গ্রন্থ সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছিল। কঠোর বা বিরূপ সুরে সমালোচনা করতেন না সমালোচক জীবনানন্দ। অলভাস হাক্সলী রচিত 'গিয়োকোন্দা সমাইল' নামক নাটিকার সমালোচনা হল চারটি বিদেশী গ্রন্থ সমালোচনার মধ্যে প্রথমটি। — যেটি ওই নামের একটি ছোটগল্পের নাট্যরূপ। নাট্যরূপটির তিনি প্রশংসা করেছেন — 'চতুরঙ্গ' ১৩৫৫, শ্রাবণ সংখ্যায়। 'চতুরঙ্গ' ১৩৫৫, মাঘ সংখ্যায় তাঁর পরবর্তী সমালোচনা 'দ্য জার্নাল্‌স্ অব আঁদ্রে জিদ' নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। 'জীবন স্মৃতি'র সঙ্গে জর্নাল-এর কিছু তুলনা করেছেন তিনি, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' জিড্-এর ভালো লাগেনি জেনে। আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্র রচনাটির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ১৩৫৬ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এটি। জীবনানন্দকৃত সমালোচনা বিষয় হিসাবে টমাস মান-এর 'ডক্টর ফস্টাস'-এর ফাউস্ট কাহিনী এবং লেখক হিসাবে টমাস মান — দুই-ই জীবনানন্দের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। তিনি সর্বাংশে স্বীকার করেছেন এই উপন্যাসটির গুরুত্ব। বিশেষত উপন্যাসটিকে তিনি নবরূপ দিয়েছেন আধুনিক যুগের সমস্যায়। 'উষা' নবম বর্ষ, তৃতীয় সংকলন ১৩৬১-তে এলিয়টের 'থ্রী ভয়েসেস অব পোয়েট্রি' তাঁর সর্বশেষ সমালোচনার অবলম্বন। এলিয়টের কবিতা সম্পর্কে খুব নতুন কোন কথা বলেননি বক্তৃতারূপে প্রদত্ত এই প্রবন্ধটিতে — এমনকি জীবনানন্দের সমালোচনার সুরও নিরুচ্ছ্বসিত।

শারদীয় 'সোনার বাংলা'য় প্রকাশিত (১৩৫৪) 'পৃথিবী ও সময়ে' প্রবন্ধটিতে সমকালীন রাজনীতি নিয়ে জীবনানন্দের সুনির্দিষ্ট ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি

প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ঃ 'শিক্ষাদীক্ষা-শিক্ষকতা' — 'মাসিক বসুমতী' কার্তিক, ১৩৫৫, 'শিক্ষার কথা' — 'দেশ' ১৪ই ভাদ্র, ১৩৫৯, 'শিক্ষা-দীক্ষা' — 'দেশ' ২১শে ভাদ্র, ১৩৫৯, এবং 'শিক্ষা ও ইংরাজী' — শারদীয় 'দৈনিক বসুমতী' ১৩৬০।

একাধিক ভাষারূপের মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করতে দেখা গেছে বহু ভাষাশিল্পীকেই। কখনও তা বৈচিত্র্যের সন্ধানে, কখনও বা গভীরতর কোন আত্ম-বীক্ষণের তাড়নায় আবার কখনও নিছকই প্রকাশের আনন্দে। জীবনানন্দ গল্প-উপন্যাস লিখলেও তা তাঁর জীবৎকালে প্রকাশ করেননি। কবিপত্নী লাবণ্য দাশ এ বিষয়ে যে তথ্যটি দিয়েছেন তা হল — কাব্যজগতে চলার পথে তাঁর জীবনকে বহুবার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে দুর্যোগের ঘনঘটা। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে তাঁর মন পথ চলতে দ্বিধান্বিত হয়েছে। রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত হয়ে কবিতায় তাঁর যে অন্বেষণ, তাতে উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেসময় তাঁর মন গল্প লেখার আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু আবার বলেছেন, কবিতা তাঁকে পথের সন্ধান দিলেও সেগুলো সকলের দৃষ্টি পথের আড়ালেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। তার এই মনোভাব দেশভাগের সময় বেশি করে অনুভূত হয়েছে। সুমিতা চক্রবর্তী এই বিবৃতিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দুটি — "প্রথমত, 'রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত' হয়ে 'কবিতার অন্বেষণে' 'নাম করা'র দিকেই কি লক্ষ্য ছিল জীবনানন্দের? তাঁর কবিতা লেখা খ্যাতির প্রত্যাশায়? কবিতার আসরে যথেষ্ট খ্যাতিমান না হতে পারার আশঙ্কায় যশোলাভের জন্যই কি তাঁর গদ্যচারণা? দ্বিতীয়ত, কাব্যজগতে 'দুর্যোগের ঘনঘটা' কি হতে পারে? কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর শত্রুতাসাধন করেছিলো কি কেউ? তাঁর জীবনীতথ্য এ ব্যাপারে বিমিশ্র উপকরণ সরবরাহ করে।" [৫]

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব চিরকালই তাঁকে পীড়িত করেছে। বেসরকারী কলেজের শিক্ষকতার পারিশ্রমিক ছিল অত্যন্ত অল্প। ব্যবসা করতে নেমেছিলেন টাকা উপার্জনের জন্য। লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সীও নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, দুটিতেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। নিজের সংসারের মানসিক পীড়ন ও আর্থিক অস্বাচ্ছল্যজনিত গ্লানি তাঁকে সহ্য করতে হতো। এ হেন অবস্থায় সমকালীন উপন্যাস লেখকদের খ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তি দেখে কখনও বা তাঁর উপন্যাস লেখার কথাও মনে হয়েছিল। 'পূর্বাশা'র সম্পাদক ও বিশিষ্ট বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তিনি একবার টাকা চেয়ে লিখেছেন, ধারের টাকা তিনি কবিতা, গল্প অথবা উপন্যাস লিখে শোধ করে দেবেন এবং একটি উপন্যাস লিখবেন বলে ঠিক করেছেন। ১৯৪৮-এ জীবনানন্দ এই চিঠিটি লিখেছিলেন এবং এই চিঠির পরে ১৯৫০-এ জীবনানন্দ তাঁকে আবার লিখেছিলেন — "এখুনি চার-

পাঁচশো টাকা দরকার; দয়া করে ব্যবস্থা করুন ... আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয় — ছদ্মনামে) পূর্বাশায় ছাপতে পারেন;" [৬] 'দুর্যোগের ঘনঘটা' বলতে তিনি আর্থিক দারিদ্র্যও বোঝাতে পারেন। তবে একথা সর্বাঙ্গীন সত্য হতে পারে না যে, জীবনানন্দের মতো একজন আপোষহীন শিল্পী মনোরঞ্জন নয়, নিজেকে জানা আর ব্যক্ত করার তাগিদে যাঁর সৃষ্টি — তিনি শুধুই খ্যাতিলাভ বা আর্থিক সাফল্যের কথা মনে রেখে কেবল গল্প উপন্যাস লিখবেন। বরং তাঁর একটি কথা মনে পড়ে — তিনি ছেলেবেলা থেকেই গল্প-উপন্যাস — স্বদেশী ও বিদেশী — নেহাত কম পড়েননি। ঔপন্যাসিক হওয়ার ইচ্ছা তাঁর আগে থেকেই ছিল।

তিনি গদ্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন কবিতা রচনা শুরু করার বছর পাঁচেকের মধ্যেই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৩১-৩২ সাল থেকেই। সেগুলি প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর কোনরকম দ্বিধা ছিল না। তবে ১৯৩১ সাল নাগাদ প্রথম ছোটগল্পটি তিনি লিখতে শুরু করলেন এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখলেও কোনদিনই তা প্রকাশ করলেন না। এই সময়কালের মধ্যে বেশ কিছু উপন্যাসেরও খসড়া তৈরি করেছিলেন তিনি। এরপর আবার এক দশক পর উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। ভারত তখন সবেমাত্র স্বাধীন, বাংলা বিভক্ত, কলকাতার কাছে বরিশাল সেইসময় বিদেশ। কলকাতার ভাড়া বাড়িতে পছন্দ মত থাকার জায়গা নেই। চারিদিক থেকে অর্থকষ্ট চেপে ধরেছে, চাকরি নেই তাঁর। তার মধ্যেও তিনটি উপন্যাস দ্রুত লিখে ফেললেন, কিন্তু সেগুলিও প্রকাশ করলেন না। কলকাতায় কিছুটা স্থিত হয়েছিলেন তিনি ১৯৫০-এর পর থেকে। একথা মেনে নেওয়া শক্ত যে তখনকার 'বনলতা সেন'-এর কবি উপন্যাস প্রকাশের কোন পথ পেতেন না। তেমনভাবে হয়তো চেষ্টাই করেননি। প্রথম কারণ নিশ্চয়ই সময়াভাবে লেখাগুলির যথাযথ পরিসমাপ্তি করতে না পারার দরুণ, দ্বিতীয় কারণ মনে হয় প্রতিষ্ঠা পাওয়াজনিত দ্বিধাবোধ। আরও একটি গভীরতর কারণের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় কবিপত্নী লাবণ্য দাশের একটি উক্তিতে — কিন্তু তিনি বলতে শুনেছেন, কবিতা যদি তাঁকে পারের সন্ধান দিতে পারে তবে তা সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালেই থেকে যাবে। সেই পথ কি যশের? না অর্থাগমের? কি সেই পথ? বোধ হয় না। নতুন যুগের ভিন্নতর উপলব্ধির পথ খুঁজছিলেন জীবনানন্দ — আমাদের অনুভূতিই আমাদের একথা বলে দেয়।

স্ব-কাল ও স্ব-সমাজের সঙ্গে মনুষ্য ব্যক্তিত্বের অবিরাম সংঘাতের আবর্ত থেকে বেঁচে থাকার যে দর্শনটি জীবনানন্দ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা কবিতায় প্রকাশ করা সহজ ছিল না।

বিশেষত তাঁর অজস্র রচনার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার ফল হল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের পৃথিবীর মোহময়তা। আর স্রষ্টা হয়ে ওঠা একান্ত কঠিন — সত্যিকারের আত্মিক বিশ্বাসের একটি জগৎ ছাড়া। সৌন্দর্য-প্রেম-মানবিকতা-ঈশ্বর বিশ্বাস — আধুনিক কবিদের জগৎ থেকে কোনটিই তেমন দূরবর্তী নয়। জীবনানন্দ তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন — যাঁরা সংশয় ও নৈরাশ্যকে অবলম্বন করে পৃথিবীতে শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছেন। দেশভাগের সময় তাই বেশী করে গদ্য লেখার মানসিক চাপ অনুভব করেছিলেন। সেইসময় তিনি তীব্রভাবে মুখোমুখি হলেন — প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আর পরিবেশের বিরূপতায়। গদ্যকে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন বেশী; ১৯৪৮-এ উপন্যাস তিনটি লেখার বছরে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল — যে কথাটা বলতে চাইছেন, সেই বলার কথাটা কবিতাতেই বলা যাচ্ছে। কবিতাকেই প্রথম প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে হয়ত তিনি বেছে নিলেন। গদ্য রচনাগুলিকে মার্জনা বা প্রকাশের চেষ্টা তাই আর করলেন না।

— তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মূলকথা প্লট সাজানোর বাস্তববর্ণনার কোন দায় তিনি স্বীকার করেননি — আত্মসত্তার মুখোমুখি উক্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে এসে দাঁড়ানোয়।

নৈরাশ্য পীড়াকে উপস্থাপন করেছেন আলবার কামু তাঁর উপন্যাসে, এই আত্ম-যন্ত্রণা অসুস্থতার পর্যায়ে পৌঁছেছে কাফ্‌কার লেখায়, সার্তের রচনায় কখনও বিবমিষা বোধ জাগিয়েছে বেঁচে থাকার অর্থহীনতা। ভার্জিনিয়া উলফ্-এর উপন্যাসে আবার মৃত্যুবোধ স্পর্শী এক সুগভীর ঔদাস্য অনুভব করা যায়। এঁদের রচনাই এঁদের আত্মদর্পণ। জীবনানন্দ বোধ হয় বাংলা উপন্যাসের একমাত্র নাম। অবশ্য ঠিক চিতনাপ্রবাহমূলক রীতির লয় জীবনানন্দের লেখা — তাঁর রীতির মূল কথাই হলো আত্মসত্তার অবাধ উন্মোচন — জীবনানন্দের রচনায় এটা পাওয়া যায় বলেই তাঁর রচনা পদ্ধতির সঙ্গে চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির মিল আছে। উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী দর্শনে ফলিয়ে তুলতে গেলে তার উপকরণ হয় ব্যক্তির অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা ও সংঘাত। বাংলা সাহিত্যের এই বোধেরও কাছাকাছি জীবনানন্দের উপন্যাস। কাহিনী রম্যতার দিকে তিনি কোন সময়ই দৃষ্টি দেননি। চরিত্রগুলির অদ্ভুত ধরনের আচরণ ও একান্ত উদ্ভট ধরনের সংলাপ বিবৃত করেছেন। উপন্যাসের শেষও করেছেন আপাত খাপছাড়া গ্রন্থনায়। সেই কারণেই তাঁর উপন্যাসে স্বাভাবিক বাস্তবতার বদলে মগ্নচেতনার নিরাবরণ ও অমার্জিত চেহারাটিতে বাস্তবতার তলশায়ী নিবিড়তর এক বাস্তবতার অনুভব পাওয়া যায় অনেক সময়ই। বাংলা উপন্যাসে একমাত্র তাঁর উপন্যাসেই পাওয়া যায় "সুররিয়ালিজমে"র ছোঁয়া — একথাও হয়তো বলা যায়।

সাল-তারিখের ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট নয় জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসে। 'গ্রাম ও শহরের গল্প' ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। সেই 'প্রতিক্ষণ' থেকে প্রকাশিত ১৯৮৩-এর শারদ সংখ্যায় 'প্রেতিনীর রূপকথা' নামক উপন্যাটির পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা ছিল -— 'August - September 1933'। 'ছায়ানট' গল্পটি সম্পর্কে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে গল্পটি লেখা হলেও এই রচনাটি দিয়েই সম্ভবত জীবনানন্দ গল্প-সাহিত্যে পা বাড়িয়েছিলেন। এ থেকেই ১৩৩১ বঙ্গাব্দ বা ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ গল্পটির রচনাকাল দাঁড়ায়। ১৩৩১-৩২ থেকেই তিনি গদ্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন — জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আরও বেশ কিছু গল্প বা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি থেকে তাই মনে হয়। প্রথম চেষ্টার ছাপ আছে 'ছায়ানট' গল্পটিতে এবং 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসটিতে। খসড়া জাতীয় লেখা বলে চেনা যায় সহজেই এগুলিকে। বোধহয় সাময়িকভাবে গদ্য লেখা বন্ধ করেন তিনি ১৯৩৬ ও তার কাছাকাছি সময়ে আরও বেশ কিছু ছোটগল্প লিখে। অনুমান করা যায় — তিনি মূলত কবিতাই লিখেছিলেন ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনটি উপন্যাস পরপর লেখেন ১৯৪৮ সালে। 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি মে-জুন মাসের মধ্যে এবং 'মাল্যবান' উপন্যাসটি জুন-এ লিখিত। 'জলপাইহাটি'র প্রথম কিস্তি ১৯৮১-এর জুলাই-এ 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় বার হবার সময় অশোকানন্দ দাশ প্রাক্‌কথনে বলেছেন — জীবনানন্দের তৃতীয় উপন্যাস 'জলপাইহাটি' 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। উপন্যাস তিনটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত। ১৯৪৮ সালে লিখিত এই রচনাটি পরিমার্জনা করে যেতে পারেননি তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসটি তিনটির মধ্যে সব শেষে লেখা — উক্ত মন্তব্য থেকে তা মনে হতে পারে। কিন্তু উপন্যাসটি রচিত হয় এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে — এটি 'প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন' থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দ সমগ্রের প্রথম খন্ডের (১৯৮৫) সম্পাদক দেবেশ রায়ের নির্দেশিকা থেকে জানা যায়। কাজেই বলা যায় তিনটির মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম লিখিত। অবশ্য আরও দুটি তথ্য উল্লেখযোগ্য গদ্য সাহিত্যে জীবনানন্দ মানসের বিবর্তন বিশ্লেষণে যাবার আগে। তিনি বরিশালে ছিলেন ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। তিনি ১৯৪৭ সালে কলকাতায় বাস করেছেন। এবং দ্বিতীয়ত বলা যায় ১৯৩০-এর পর পাঁচ বছর ও ১৯৪৭-এরপর আড়াই তিন বছর অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিলেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতার পর বাংলা ভাগ হয়ে গেছে। কলকাতার ভাড়া বাড়িতে চাকরিহীন বেকার জীবনানন্দ তাই এই আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। সুতরাং টাকা যে একটা প্রবল শক্তি মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে — এই উপলব্ধি সে সময় তাঁর

মনে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। মানুষ ও টাকার সম্পর্ক মানব অস্তিত্বের একটি আদি সূত্র রূপে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৮-এর উপন্যাস চারটিতে। তিনি খুব নতুন ভাবে ভেবেছেন বিষয়টিকে। ধনবিজ্ঞান-সচেতনতা হল তাদের মধ্যে প্রধান — মনন চালনার যেসব পথে পশু-পাখির ওপর মানুষ আধিপত্য বিস্তার করেছে। নানারকম বিনিময় ব্যবস্থা তখনও ছিল যখন মুদ্রার সৃষ্টি হয়নি। মানুষের নিজস্ব সভ্যতা, নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এই উৎপাদন বন্টন সচেতনতা। তাই আমরা তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি — অর্থ উপার্জন সমস্যা মানুষকে কি পরিমাণে পরিচালিত করে, বিপর্যস্ত করে, পৌঁছতে পারে উপন্যাসের মূল অস্তিত্ব পর্যন্ত।

'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসও 'ছায়ানট' গল্পটির রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক বলা যায়। গল্পটি থেকে উপন্যাসটি তুলনামূলকভাবে সুসম্পূর্ণ ও সুলিখিত। তবে প্রথম রচনা হিসেবে কেউ কেউ গল্পটির লেখনরীতি কিছু আড়ষ্ট বলে মনে করেছেন, কিন্তু এই বিষয়ে মতান্তর থাকতেই পারে। জীবনানন্দের গল্প সংকলনকে আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন — "সবকটি গল্পেরই বিষয় প্রণয় এবং শরীর লিপ্সা।" 'ছায়ানট'-এর ক্ষেত্রে গল্পটি সম্পূর্ণ সত্য। অনবদ্য একটি শব্দবন্ধ চয়ন করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পটির মর্মকথা বোঝাতে গিয়ে — "মিথুন সমীক্ষণ" (জীবনানন্দ দাশের গল্প)। ঐ আলোচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এরপর বলেছেন — "গল্প হিসেবে কোনটাই বিশেষ কিছু নয়। এলোমেলো বর্ণনা, একটু পাগল পাগল কথাবার্তা, কোন গল্পেরই ঠিক শুরুও নেই শেষও নেই — কিন্তু পড়তে চমৎকার লাগে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই পৌষ ১৩৮০)। 'ছায়ানট' গল্পের নায়ক-নায়িকার পূর্ণায়ত রূপ হল 'মাল্যবান' উপন্যাসের মাল্যবান ও উৎপলা। 'সুতীর্থ' ও 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে কোন না কোন ভাবে যৌনবোধ সচেতন হয়ে উঠেছে। সম্পর্ক নির্বিশেষে নারী ও পুরুষ সমস্থানবর্তী হলে কখনও মগ্নচেতনার তল থেকে ভেসে আসা কোন উপমা, কখনও প্রকাশ্য ভাষায়, কখনও বা স্পষ্ট ভাবনায় উচ্চারণই এর হঠাৎ চমক। সেদিক থেকে জীবনানন্দের উপন্যাসগুলির একটি মূল লক্ষণ প্রথম ধরা পড়েছে 'ছায়ানট' গল্পটিতে। জীবনানন্দের কবিতাতেও কিন্তু একটি প্রখর শরীরচেতনা ও তীব্র যৌনতাবোধ বহমান — প্রকৃতির রহস্যময়তা, ইতিহাসের দূরত্ব, সময়বোধ ও সমাজবোধ, মৃত্যুবোধের বিষণ্ণতা, পরাবাস্তব অস্পষ্টতা — সবকিছুর আড়ালেও। অনেকগুলি সুতোর ঘন বুনোট থাকে তাঁর কবিতার প্রতিটি পংক্তিতেই। সেখানে যৌনতাবোধের সূত্রটিও খুবই সুপ্রত্যক্ষ।

জীবনানন্দের উপন্যাস কখনই প্রচলিত অর্থে শেষ হয় না — তাই ১৯৩৩-এ রচিত

'প্রেতিনীর রূপকথা'র আকস্মিক পরিসমাপ্তি থেকে জোর করে বলা যায় যে, লেখাটি শেষ হয়নি। একমাত্র 'মাল্যবান' এরই রচনারীতিতে আছে কার্যকারণ শৃঙ্খলা এবং আছে শুরু, শেষ ও মধ্যবর্তী গতিপথের একটা সুসামঞ্জস্য। অন্যদিকে বাকি তিনটি উপন্যাসের রীতিতে কিছু শিথিলতা এসেছে। বিশেষ কোন পরিকল্পনা নেই এর সূত্রপাত ও সমাপ্তির মধ্যে। মাঝপথেই থেমে যায় গল্পাংশের সমস্যাটি বা চরিত্রগুলি। শেষের দিকে প্রায় চরমে উঠেছে 'জলপাইহাটি'তে এই ছাপছাড়া ভাবটা। কিন্তু গভীর মনসংযোগ করলে দেখা যাবে, কাহিনীর সূচনা কিংবা সমাপ্তি কোনটিই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

বাংলায় তেমনভাবে যথার্থ আত্মজৈবনিক উপন্যাসও লেখা হয়নি। জীবনানন্দের একটি সুচিন্তিত মত ছিল আধুনিক উপন্যাসের আত্মজৈবনিকতার লক্ষণ বিষয়ে। তিনি "The Bengali Novel Today" — নামে একটি প্রবন্ধে (Hindusthan Standard, 3 September, 1950) বলেছিলেন যে, কোনও একজনের অভিজ্ঞতায় কোন অর্থেই আর সমগ্রতাকে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না — এ যুগে জীবনের বিস্তার ও জটিলতা বৃদ্ধির ফলে। আর তার ফলে — "each novelist's individual experience appears to shrink and become more and more specialised as the extend and complexity of the total human experience augment all around."[৭] তারপর তিনি আধুনিক উপন্যাসের সার্থকতা খোঁজার কথা বলেছেন।

তাঁর গল্প উপন্যাস থেকে ক্ষুব্ধ ফণা তুলে দাঁড়ায় — আধুনিক মানুষের ধর্মবোধহীন মানব-নীতির অস্তিত্বের সমস্যা। মাঝে মাঝে অভ্রান্ত লক্ষ্যে দংশন করে। তাঁর রচনাগুলির অতুলনীয়তা এখানেই। সঙ্গীত রচনা

১৩৫৩

শ্রাবণ-ভাদ্র ঃ এই সময় ১৪টি গান রচনা করেন।

গানগুলির প্রথম লাইন ঃ

১. আজ বিকেলে ধূসর আলোয়

২. রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে

৩. সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম

ক. পৃথিবীতে যত ইতিহাসে যত ক্ষয়

৪. অন্ধকারের ঘুম সাগরের রাতে

৫. আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো

৬. আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর থেকে এসে

৭. ঘুমের হাওয়া ঘুমের আলো

৮. দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে আজ এ পৃথিবীর

৯. কাউকে ভালো বেসেছিলাম জানি

১০. তোমার সাথে আমার ভালোবাসা

১১. ভোরের বেলায় তুমি আমি —

১২. ধ্বনি পাখীর আলো নদীর স্মরণে এসেছি

১৩. তুমি আমার মনে এলে

১৪. মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাহা

'বাল্মিকী প্রতিভা'-তে রবীন্দ্রনাথ হাগনারের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, শব্দ এসে শেষ হয়ে যায় যেখানে, সেখানে সুর লাগে না। বার বার শব্দের অজস্রতাই ধরা পড়ে জীবনানন্দের প্রাচুর্যহীনতার সংসারে। গানের আসর মনের গভীরে কখনও কখনও দ্বিতীয়ার চাঁদের মত উঁকি দিয়ে যায়। যদিও সুর সম্বলিত গানের স্বরলিপিগুলি এখনও পাওয়া যায় নি; তবে কাব্যের আয়োজনই সাধিত হয়েছে সুর ব্যতিরেকে শব্দ শরীরের চেতনায়। রোম্যান্টিক মনোভাবের একটি ধূসর আলো লক্ষ্য করা যায় কবির সঙ্গীত রচনায়। মূলত সুর নির্ভর হয় গানের আলোচনা, তখন শব্দ শরীর নিয়ে গানের আলোচনা কবিতার এপিঠ-ওপিঠ সুর যেখানে অনাবিস্কৃত। তাই বলা যায় সঙ্গীত সম্ভারে ব্যাপ্ত নন জীবনানন্দ, প্রচলিত অর্থেও তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীত আজও অধরা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে সাহিত্যের বিবর্তন পথে এই সংযোজন তাঁর পরিসরকে ব্যাপ্ত করে মাত্র।

উল্লেখপঞ্জি

১। জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ (পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-২), পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সম্পাদনা – ভূমেন্দ্র গুহ, পৃষ্ঠা – ২০১, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০০

২। তদেব, পৃষ্ঠা – ২০২

৩। জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ১০১, (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশকে লেখা চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৩) প্রকাশক – সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ – মে, ১৯৮৬

৪। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা জীবনানন্দের দুটি পত্র, মুদ্রিত হয়েছে 'মহানগর', নভেম্বর, ১৯৮২ তে। উদ্ধৃতির মধ্যে একটি শব্দ আছে 'গদ্য প্রবন্ধ'। 'মহানগর'–এ ছাপা হয়েছে 'পদ্য প্রবন্ধ'। কিন্তু সেখানে এই পত্রটিরই পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হয়েছে। তাতে বেশ স্পষ্টই দেখা যায় — শব্দটি 'গদ্য প্রবন্ধ' এবং বিভ্রান্তির নিরসন ঘটে। মূল উৎস – জীবনানন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল, সুমিতা চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা – ৭২, প্রকাশক – শ্রী নেপাল চন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিজন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ – ফাল্গুন ১৩৯৩। মার্চ ১৯৮৭

৫। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৭

৬। জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৯৬, (জীবনানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭), প্রকাশক – সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ – মে, ১৯৮৬

৭। The Bengali Novel Today — জীবনানন্দ দাশ। উৎস – জীবনাননন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল, সুমিতা চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা – ২৭৪, প্রকাশক – নেপাল চন্দ্র ঘোষ। সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিজন স্ট্রীট, কলকাতা ৬, পরিবর্ধিত ও দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২৫ বৈশাখ ১৪০৮; ৮ মে ২০০১